৮

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার হালচাল

আবদুল মান্নান

গত কুড়ি বছরে বাংলাদেশে যে সকল ইন্সটিটিউশন বা বিষয়সমূহ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শাসনামলের স্বল্পকালে যে ক'টি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন। তৎকালীন সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাইয়ে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় যা কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন নামে সর্বাধিক পরিচিত। কারণ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ছিলেন এই উনিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের প্রধান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, "বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথনির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করেন।" ১৯৭৪ সালের ৩০ মে সরকারের কাছে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য যে কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জিয়া এবং এরশাদ সরকার শিক্ষাবিষয়ক একাধিক কমিশন গঠন করলেও সে কমিশনসমূহ কোন বাস্তবমুখী বা যুগোপযোগী রিপোর্ট প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সকল রিপোর্ট যারাই প্রণয়ন করে ছিলেন তাঁরা কখনোই দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারেননি। এসব রিপোর্ট ছিল মূলত পশ্চাদমুখী, বিজ্ঞান বিমুখ একটি আধামুর্খ প্রজন্ম সৃষ্টির দলিল বিশেষ।

বেগম জিয়ার সরকার কোন প্রকার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হতে বিরত থেকেছে। তবে তাঁর শাসনামলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয়করণের মাধ্যমে বিপর্যস্ত করার প্রতিযোগিতায় তিনি যে পূর্ববর্তী সকল সরকারের তুলনায় প্রথম হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে হলে জিয়া পরিষদের সভাপতি বা সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা হতে হবে তাঁর আমলে তা একটি অলিখিত বিধানে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ডিত্য বা প্রশাসনিক যোগ্যতা এখানে ছিল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। দেশের যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৪ বলবৎ ছিল সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম জিয়ার শাসনামলের অধিকাংশ সময়ে একটি ছাড়া আর সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে ছিলেন তাঁরই একান্ত বশংবদ মনোনীত ব্যক্তিবর্গরা। এদের কারও দায়িত্ব ছিল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের খসড়া করে দেয়া কাও দায়িত্ব ছিল। সময় সময় সামরিক শাসক জিয়ার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের নিয়ে কারণে অকারণে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা।

বিগত সরকারের আমলে একেবারেই নিষ্প্রয়োজনে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নামক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম দিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াটাকে আরও তরান্বিত করা হয়েছিল। সারা বিশ্বে যেখানে সকল কিছু বিকেন্দ্রীকরণ করার সুবিধা এখন প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত, সেখানে সরকারের এক নির্দেশ বলে দেশের সকল কলেজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। এর আগেই এই কলেজসমূহ ঢাকা, রাজশাহী আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই ধরনের কলেজের সংখ্যা প্রায় ছয় শতের উপরে। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকাকালে আর কিছু না হোক অন্তত কলেজসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় তার লেখা-পড়ার মান এবং কলেজে বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সমূহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। এ সবের বালাই এখন বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে উঠে গেছে। অভিযোগ উঠেছে যে এখন কলেজসমূহকে স্বীকৃতি দান বা পরীক্ষার সেন্টার দেওয়ার সময় একটা বিরাট অংকের অর্থ লেনদেন হয়। এই ব্যবস্থার প্রক্রিয়াটাও অভিনব। পরীক্ষার সেন্টার নির্ধারণের সময় বেশ কিছু কলেজকে শনাক্ত করা হয় সেগুলোকে সেন্টার দেওয়া হবে না। পরবর্তী কালে নানা কারসাজির মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র কোন কলেজকে স্বীকৃতিদান বা পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা এখন কলেজে কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্সও চালু করেছে। এই সব কলেজে না আছে পর্যাপ্ত সংখ্যক উচু ক্লাসে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক, না আছে কোন প্রকারের ভাল গ্রন্থাগার। এ সবের ফলে দেশে শিক্ষার মান হয়ে পড়েছে একেবারেই নিম্নশ্রেণীর। আমার মন্তব্যে কলেজসমূহে আমার কোন কোন সহকর্মী আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা হয়ত ধারনা করবেন যে, কলেজসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্তি পাওয়াতে আমরা ঈর্ষান্বিত। তাদের আশ্বস্ত করার জন্য বলতে চাই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কেউই তাদের বর্তমান অবস্থানের কারণে সম্ভবত ঈর্ষান্বিত নয়। দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সন্তানরাই লেখা-পড়া করে। যে কোন বিবেকবান অভিভাবক চাইবেন তাদের সন্তানরা সনদপত্রসর্বস্ব শিক্ষা নয়, প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত হয়ে উঠুক।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগও বেশ চমকপ্রদ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল বারী আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সামরিক জান্তার খুবই আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি রাজশাহী অঞ্চলে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের সমর্থনে, বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে বেড়াতেন। এর পুরস্কার স্বরূপ টিক্কা খান তাঁকে প্রাদেশিক শিক্ষা সংস্কার কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীকালে এই টিক্কা খানই তাকে ১৯৭১-এর ১৭ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম উপাচার্য নিয়োগ করেছিল। বাংলাদেশ পাকিস্তানী দখলদার মুক্ত হওয়ার পর ডঃ বারীকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দেয়া হয়। ১৯৭৫-এ ১৫ আগস্টের পর তাঁকে জিয়া সরকার পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়। পরবর্তীকালে তাঁকে করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান। সেখান হতে তাঁর অবসর গ্রহণের পর তাঁকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়। যেহেতু মর্যাদার দিক হতে একজন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের নিচে অবস্থান করেন, সে কারণেই একজন ডঃ বারীর 'সম্মান' রক্ষার্থে বেগম জিয়ার সরকারের আমলে এক নির্বাহী আদেশে ডঃ বারীর মর্যাদাকে মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের সমতুল্য করা হয়। ডঃ বারীর সমসাময়িক ব্যক্তিরা বহু পূর্বে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের শ'খানেক পদ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এ সব পদে যাতে প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিয়োগপ্রাপ্ত হন, সেদিকে বর্তমান সরকার নজর রাখবেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশা করে।

বিগত সরকার শুধু যে উপাচার্য, উপ-উপচার্যের পদসমূহ দলীকরণ করেছিল, তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগ কমিটি, সিন্ডিকেট, সিনেট ইত্যাদি বিধিবদ্ধ পর্ষদসমূহ একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি না হলে কারও পক্ষে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর উপ-উপাচার্য দু'জনকেই সাবেক সরকার অস্ত্রিজেন দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন। উপাচার্যের অগণতান্ত্রিক নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রায় তিন বছর আগে হাই কোর্টে রীট মামলা হয়েছিল। এক অজ্ঞাত কারণে সেই মামলার আজ অবধি নিষ্পত্তি হয়নি। তাঁর চার বছরের মেয়াদ শেষ হলে তিনি অবশ্য উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু পর্দার অন্তরালে অন্য আরেকটি নাটক মঞ্চায়িত হবার সুবাধে তাঁকে সাবেক সরকার তাঁর দায়িত্ব পালন করে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। উপ-উপাচার্যের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমার কতিপয় সহকর্মী, যাঁরা সব সময় সরকারী দলের সদস্য তাঁরা ইতোমধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। পদ দুটো বাগানোর জন্য তাঁরা বেশ ঢাকা-চট্টগ্রাম যাতায়াত করা শুরু করে দিয়েছেন। কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ধরনা দিয়ে তাঁকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ১৯৭৫ সালে তাঁরা গায়ে বাকশালের হাওয়া লাগিয়েছিলেন। কেউ বলার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রীর ছোট ভাই তার সহপাঠী ছিল। কেউ গিয়ে বলার চেষ্টা করছেন বঙ্গবন্ধুর বেডরুম পর্যন্ত তার প্রবেশাধিকার ছিল। তাদের কেউ এ পর্যন্ত সফল হয়েছেন বলে শোনা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকেই সাবেক সরকারের আমলের অযোগ্য, অথর্ব্য ও দলীয় ব্যক্তিদের প্রভাব হতে মুক্ত করে সেখানে বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী সকল বক্তৃতা-বিবৃতিতে বেশ জোরের সাথেই বলছেন তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবের উর্ধে রেখে যোগ্য ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করতে চান। বাংলাদেশের বারকোটি মানুষ দেখতে চায়, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথায় ও কাজে কোন গরমিল নেই। তিনি যা বলেন তা করার চেষ্টা করেন।

আমরা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে, সকল ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে চাই দক্ষ ও গুণগত মানসম্পন্ন জনশক্তি। ইংরেজীতে যাকে বলে Quality manpower. এর জন্য চাই Quality education. বিরাজমান অবস্থায় বর্তমানে তা অর্জন করা রীতিমতো কঠিন কাজ। তা করতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো নৈরাজ্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা আর কোন দেশে চালু আছে বলে আমার জানা নেই। নতুন সরকারকে এসব বিষয় দ্রুত উপলব্ধি করতে হবে এবং তার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের সাথে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাতে সময় একেবারেই কম। তা করতে ব্যর্থ হলে আমরা পশ্চাদপর, সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন, অদৃষ্ট নির্ভর এক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব।